Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.118-123
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রসঙ্গ পরমাত্মতত্ত্ব: পাথেয় কর্মযোগ: প্রেক্ষাপট শ্রীগীতা

অতনু সাহা
এম ফিল স্কলার, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

The human being faces different types of worldly sorrows and sufferings and also tries to find out the ways by which he could transcend him from that sorrows and sufferings. But the question is why the human being faces this type of sorrows and sufferings? We can see in Indian philosophical tradition that, they consider ignorance or false knowledge (avidyā) as the main cause of all sorrows and sufferings. According to them due ignorance human being attached himself with the material or worldly objects and undergoes various sufferings. According to them to dissociate itself from the attachment with the material body destruction of all the qualities of the soul is required. In this regard SriGitas concept is very prominent and practical. Karmayoga is that theory and also a path way to dissociate itself from the attachment with the material body by destroying all the qualities of the soul like, pain, pleasure, desire, cognition, merit, demerit, impression etc. The unselfish performance is the foundation of karmayoga by which one can perform without any desire which may lead to liberation or moksa. In this short discourse I have tried to focus on karmayoga as a way by which one could transcend him from that worldly sorrows and sufferings as well as the means by which the individual would be capable to realize that the eternal soul is neither the body, nor the mind, nor the sense.

সকল সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল জড়ত্বের থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা। জড়তা থেকে সম্পর্ক ছেদ করার প্রক্রিয়াতে তফাৎ পরিলক্ষিত হলেও জড়ত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিকে সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। জড়ত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়। জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হওয়ার পূর্বে যে মিলন হয় সেই মিলন যে সেতুটির মাধ্যমে সম্ভব হয় সেই সেতুটিই গীতায় 'যোগ' নামে অবিহিত হয়েছে। গীতায় একাধিক 'যোগ'-এর কথা বলা হয়েছে, শুধু তাই নয় আঠারোটি অধ্যায় বিশিষ্ট গীতার প্রতিটি অধ্যায়েই 'যোগ' শব্দটি বহুবার ব্যাবহৃত হয়েছে। এক একটি যোগ এক একটি সেতুর ন্যায়, প্রকৃত পক্ষে এই যোগ হল জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার ঐক্যসাধনের সেতু। জড়ত্ব থেকে মুক্তি প্রাপ্ত জীবাত্মার পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি সম্ভব তখনই যখন এই যোগ নামক ঐক্য সাধনের সেতুটি জীবাত্মা কে পরমাত্মায় উত্তীর্ণ করে বা মিলিত করে। জীবাত্মার এই পরমাত্মায় উত্তরণ বা মিলন কিভাবে সম্ভব গীতা অনুসরণে এই আলোচনাই এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। অষ্টাধ্যায়ী গীতার মূলত দুটি অধ্যায়— সাংখ্য যোগ ও কর্ম যোগ অনুসরণে এই আলোচনা গতি লাভ করবে। তবে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য অধ্যায়গুলিও এই আলচনায় স্থান পাবে।

জড়ত্ব থেকে মুক্তি লাভ করার পর সমস্ত সাধনই এক হয়ে যায় অর্থাৎ শেষে সকল সাধনার দ্বারায় সেই এক সমরূপ পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হয়। এই সমরূপ পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিকেই গীতায় 'যোগ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং একেই 'নিত্যযোগ' বলা হয়েছে। এই নিত্য যোগের অনুভব করাবার জন্যই গীতায় তিন প্রকার যোগপথের বর্ণনা করা হয়েছে— কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। স্থূল, সুক্ষ্ম এবং কারণ —এই তিনটি শরীরেরই জগতের সঙ্গে অভিন্ন সম্বন্ধ থাকে। তাই এই তিনটিকে অপরের হিতার্থে প্রয়োগের নামই কর্মযোগ। নিজে এই তিনটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ স্বরূপে স্থিত হওয়ার যে পন্থা তাকেই বলা হয়েছে জ্ঞানযোগ এবং ঈশ্বরে নিজেকে অর্পণ করে দেওয়ার যে পথ তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ।[১] এই তিন

যোগে সিদ্ধি লাভ করার জন্য অর্থাৎ নিজেকে উদ্ধার করার জন্য মানুষ তিনটি শক্তি লাভ করেছে— (১) কিছু করার শক্তি(বল), (২) কিছু জানার শক্তি(জ্ঞান), (৩) কিছু মানবার শক্তি(বিশ্বাস)। কিছু করার শক্তি নিঃস্বার্থভাবে জগতের সেবা করার জন্য, যা কর্মযোগের অন্তর্গত। জানবার শক্তি নিজের স্বরূপ জানার জন্য, যেটিকে জ্ঞানযোগ বলা হয়েছে। মানবার শক্তি ঈশ্বরকে অর্থাৎ ঈশ্বরে সমর্পিত হওয়ার জন্য, এটি ভক্তিযোগ। যার কর্মে অধিক রুচি বা আগ্রহ থাকে, সে কর্মযোগের আধিকারি। যার নিজেকে জানার আগ্রহ বেশি পরিমাণে থাকে, সে জ্ঞানযোগের অধিকারী। যার ঈশ্বরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেশি মাত্রায় থাকে, সে ভক্তিযোগের অধিকারী। এই তিন যোগ পন্থা-ই পরমাত্মা প্রাপ্তির পৃথক পৃথক সাধন। এই প্রকৃত পথ প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজন একজন আধাত্মিক এবং নৈতিকতা সম্পন্ন পথপ্রদর্শকের। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, গীতার দৃষ্টিতে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নয়। যদিও জ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে মুক্তির উপায় বলে গণ্য হয়, কর্ম এবং ভক্তিও তাই, তবে তাঁর অর্থ এই নয় যে, জ্ঞানমার্গে মুক্তির ক্ষেত্রে কর্ম নেই বা কর্মমার্গে মুক্তির ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভুমিকা নেই। গীতার এক মহৎ অবদান হল গীতা কখনও কর্মবিমুখতাকে প্রাধান্য দেয়নি।[২] জ্ঞানযোগের সাধন হোক বা ভক্তিযোগের সাধন, সব ক্ষেত্রেই গীতায় নিরবিচ্ছিন্ন কর্মসাপেক্ষতার ধারা লক্ষ্যনীয়। জ্ঞানযোগীকে কর্মত্যাগী হতে উপদেশ দেয়নি, ভক্তিযোগীকেও কর্মবিমুখ হতে বলেনি।

মহর্ষিগণ বলে থাকেন আত্মজ্ঞান লাভের বিভিন্ন মার্গ বা উপায় বোঝাতেই 'যোগ' শব্দটি গীতায় বারবার ব্যাবহার করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল সাধারণ জীবের পক্ষে কোনটি শ্রেয়? গীতাকার স্বয়ং এই দ্বিধা দূর করেছেন পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে— সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ দুটিই কল্যানকারী; কিন্তু এই দুটির মধ্যে সাংখ্যযোগ অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। গীতাকার এ বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন যে কর্মানুষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা কোনও জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, সকল প্রকার কর্মশূন্য হলে জীবের শরীরযাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে জীবের পুরুষার্থ লাভের প্রশ্নটিই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পরবে। জীবের শরীরই যদি না থাকে তাহলে পুরুষার্থ লাভের সাধনা করবে কে? তাই নিঃশেষে কর্ম ত্যাগের কল্পনা নিছক কষ্ট কল্পনা মাত্র (গীতা ১৮/১১)।[৩]

কর্মযোগের স্বরূপ, তার বিকাশের ধারা এবং অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ নানান ভেদ বিষয়ক বিষদ আলোচনার পূর্বে 'যোগ' শব্দটির স্বরূপ উদঘাটন প্রয়োজন। বৈদিক ঋষিদের মন্ত্রে বিধৃত, ঔপনিষদীয় সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মনন ঋদ্ধ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় এই 'যোগ', দর্শনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন সাধনমার্গের পাথেয়। যোগের এই সর্ব ব্যাপকতার বীজ নিহিত রয়েছে তার স্বরূপেই। 'যুজ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ' প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'যোগ' শব্দটি উচ্চারণে দুটি অর্থ প্রথমেই অভিব্যক্ত হয়। প্রথমটি হল 'সংযোগ' এবং দ্বিতীয়টি 'সমাধি'। কারণ শাব্দবোধের অন্যতম উপায় ব্যাকরণের ধাতুপাঠে 'যুজ্' ধাতুটি দ্বিবিধ অর্থে পঠিত হয়ে থাকে। প্রথমত, 'যুজির্ যোগে' এই অর্থে কর্তৃবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন যোগ শব্দটি সংযোগ অর্থকে দ্যোতিত করে। শব্দটি করণবাচ্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সংযোগের সাধন, যা দ্বারা সংযোগ সাধিত হয় বা মেলক। অপরপক্ষে 'যুজ্ সমাধৌ' অর্থে যোগ শব্দ গ্রহন করলে সেটি সমাধি অর্থেরই প্রকাশক হয়। যোগসূত্রের ভাস্যকার মহর্ষি ব্যাসদেব সমাধি অর্থে সূত্রস্থিত যোগ শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'যোগঃ সমাধিঃ'। সমাধি বা একাগ্রতা বোধক যোগ শব্দটি যদি করণবাচ্যে প্রযুক্ত হয় তাহলে যার দ্বারা সমাহিত হয় সেই সাধনসমূহকে বোঝায়। পতঞ্জলি প্রদর্শিত যোগের অষ্টাঙ্গ সমাধি অবস্থা প্রাপ্তিতে সহায়ক হওয়ায় যোগ শব্দের সীমায় তাদেরও অন্তর্ভুক্তি হবে। এই দুই প্রধান অর্থ ভিন্ন 'যোগ' শব্দটি নানা অর্থের প্রকাশক। 'শব্দকল্পদ্রুমঃ' গ্রন্থে 'যোগ' শব্দের তেতাল্লিশটি অর্থ উক্ত হয়েছে। এই সমস্ত অর্থ কোথাও জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, কথাও জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিষয়রূপে, কথাও বা আধ্যাত্মিক বিষয়রূপে ব্যাখ্যাত।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'যোগ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দ্বিবিধ। প্রথমটি সংযোগাত্মক এবং অন্যটি সমাধি অর্থবোধক। উপনিষদে 'যোগ' শব্দটি প্রথম অর্থে গৃহীত। 'যুজ্যতে অনেন' এই অর্থে 'যুজ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'যোগ' শব্দের অর্থ 'যার দ্বারা যুক্ত হয়'। এই যোগ বা সংযোগ জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার, যা উভয়ের ঐক্যের নামান্তর। এই ঐক্যজ্ঞান বা নিজের স্বরূপজ্ঞান হলে জীবের ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃতি তথা মুক্তিলাভ হয়, যা উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং যোগ হল সেই পরমপদে পৌঁছানোর উপায়স্বরূপ।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যাত ও সাধনপ্রনালী অনুসৃত হয়েছে। যদিও যোগতত্ত্বের সামগ্রিক যুক্তিঋদ্ধ স্বরূপের সূত্রাকারে প্রকাশ ঘটে মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত 'যোগসূত্র' গ্রন্থে। গ্রন্থটি সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ এবং কৈবল্যপাদ ভেদে চারটি ভাগে বিভক্ত। উক্ত চারটি পাদে যথাক্রমে একান্ন, পঞ্চান্ন, ছাপান্ন, চৌত্রিশটি সূত্রের মাধ্যমে সমগ্র যোগতত্ত্বকে সুবিন্যস্ত করে আচার্য পতঞ্জলি যোগের তথা সমাধির স্বরূপ, বিভাগ, যোগের বিবিধ অঙ্গ, যোগসিদ্ধির উপায়,

বিভূতি ও কৈবল্যাদি তত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থটিকে পরবর্তীকালীন যোগসাধনা এবং যোগতত্ত্বজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক ব্যাক্তির নিকট উপজীব্য গ্রন্থরূপে উপস্থাপিত করেছেন।[৪] শুধু তাই নয়, পরবর্তী আচার্যগণের রচিত সুগভীর যোগতত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহের আকরগ্রন্থরূপে মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত 'যোগসূত্র' একাধারে শাস্ত্রগ্রন্থ ও দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

যোগের স্বরূপকথনে তথা যোগসিদ্ধির উপায়নিরূপনে কৃতসংকল্প মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগ' পদের সমাধিরূপ অর্থ গ্রহণ করেছেন। সেই কারণে যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব স্পট ভাবে নির্দেশ করেছেন - 'যোগঃ সমাধিঃ'। 'যুজ্ সমাধৌ' ধাতুনিষ্পন্ন সমাধি অর্থবিশিষ্ট যোগের লক্ষণে পতঞ্জলি বলেছেন - 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। চিত্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধকেই যোগ বলে। লক্ষণস্থ 'নিরোধ' পদের অর্থ নাশ বা বিনাশ নয়। বৃত্তিগুলির নিজ নিজ অধিকরণে লয় হওয়াকে নিরোধ বলা হয়েছে। সুতরাং চিত্তের বৃত্তিসমূহ যখন স্বকারণে লয় হয় তখন চিত্তের সেই অবস্থা 'যোগ' পদবাচ্য।

কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উদ্দেশ্যে যে শ্রেয়ের অনুশাসন উপস্থাপন করেছেন তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামক অনুপম শাস্ত্র। অর্জুনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রপত্তি বা শরণাগতির বাণী - 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'(গীতা ২/৭)। শরণাগত শিষ্যের সমস্ত মোহ, দ্বিধা নিবারণের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন -

"যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যাসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে"।।(২/৪৮)

ভগবান অর্জুনকে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করে 'যোগস্থ' হয়ে কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন, যা সমতা বুদ্ধিতে পর্যবসিত। কর্মের মধ্যে সমত্ববোধের অর্থ কার্য সিদ্ধিতে হর্ষ ও অসিদ্ধিতে বিশাদগ্রস্ত না হয়ে অবিচলিতভাবে অবস্থান করা। এই নিরুদ্বিগ্ন অহংকার বর্জিত কর্ম যোগে পরিণত হয়। অর্থাৎ বিষম কর্মের মধ্যে সম থাকার নাম যোগ।[৫]

সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগ কর্ম হলেও তা দুষ্কর্মের নাশ করায়, এই যোগ কর্মকৌশল রূপে বিবেচিত। তাই গীতায় বলা হয়েছে, - 'তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'(২/৫০)। সুকৃত কর্ম স্বার্গাদির এবং দুস্কৃত কর্ম নরকাদির কারণ হওয়ায় উভয়ই ত্যাজ্য। কিন্তু কর্ম সদা আচরণীয়। তাই যেভাবে কর্ম সম্পাদন বন্ধনের কারণ হয় না সেইরূপ করণীয়। সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগই সে কর্মকৌশল। এই কুশলতা শিক্ষণীয়।[৬]

কর্মযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে যোগের আলোচনার সাথে সাথে খুব স্বাভাবিকভাবেই কর্মের প্রসঙ্গও এসে পড়ে। তাই প্রশ্ন জাগে, কর্ম বলতে কী বোঝায় বা কর্ম কাকে বলে? 'কৃ' ধাতুর উত্তর 'মন' প্রত্যয় যোগে 'কর্ম' শব্দটির উদ্ভব। 'কৃ'-ধাতুর অর্থ 'করা', সাধারণভাবে যা কিছু করা হয়, তাই কর্ম। জীব (মানুষ) কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে কোনও প্রকারে, যা কিছু করে তাই কর্ম। কর্মই (শারীরিক ও মানসিক) জীবের লক্ষণ। জীবের জীবনধারণের জন্য বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সব সময়ই সংগ্রাম করতে হয়। এই জগতে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সবসময় নিরলস সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রামের অর্থই কর্ম।

শ্রী গীতার অষ্টম অধ্যায়ে কর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কর্ম হল এক ধরণের ত্যাগাত্মক (বিসর্গ:) কাজ যা সকল প্রাণির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির হেতু হয়। আবার কর্ম বলতে যজ্ঞার্থ কর্মের কথাও গীতায় বলা হয়েছে। তাই এদিক থেকে দেখলে গীতোক্ত কর্ম বলতে বিধিসম্মত যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মকেই বোঝা উচিত। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, গীতায় অনেক ক্ষেত্রে 'কর্ম' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ সাধারণ কাজ বোঝাতেও 'কর্ম' কথাটির প্রয়োগ হয়েছে। শ্রীগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলতে শোনা যায় যে, কর্ম না করে কেউ ক্ষণকালও থাকতে পারে না, তখন এই 'কেউ' (কশ্চিৎ) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 'কর্ম' কথাটি লৌকিক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। যদি তা না হতো তাহলে কর্মের ক্ষণমাত্র বিরতি অসম্ভব বলে গণ্য হতো না। আবার এই শ্লোকেরই উত্তরার্ধে কর্ম আবশ্যিক তা দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতির গুণত্রয় (সত্ত্ব-রজো-তম) মানুষকে কর্ম করিয়ে ছাড়ে। এখানেও 'কর্ম' শব্দটি সাধারণ লৌকিক অর্থকেই বুঝিয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

কর্মযোগ তথা গীতাশাস্ত্র উপলব্ধি করার মূলমন্ত্র হল কর্মের এই পরিভাষা। গীতায় বলা হয়েছে যজ্ঞের অনুষ্ঠানই কর্ম অর্থাৎ কর্ম একটি নির্ধারিত প্রক্রিয়া। এই যজ্ঞার্থ কর্ম ছাড়া জগতে যা কিছু করাহয় সে সমস্তই (কর্মই) ইহ জাগতিক বন্ধন সৃষ্টি করে, একমাত্র কর্ম হল যজ্ঞের প্রক্রিয়া। যজ্ঞার্থ কর্ম ছাড়া সংসারী মানুষ সবকিছু করে থাকে, এগুলির মধ্যে কিছু কাজকে সকাম আবার কিছু কাজকে নিষ্কাম বলে মনে করে থাকে। কিন্তু গীতায় যে কর্মের কথা বলা হয়েছে এগুলি সেই প্রকার কর্ম নয়।

'অন্যত্র লোকহয়ং কর্মবন্ধনঃ' –যজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া যা কিছু করা হয়, সব কিছুই ইহজাগতিক বন্ধনের কারণ হয়, মোক্ষ প্রদানকারী কর্ম নয়। বস্তুত, যজ্ঞের অনুষ্ঠানই কর্ম।

কর্মের এই বিধিবদ্ধ তাত্বিক আলোচনার নির্যাস আস্বাদন করে বলা যেতে পারে যে শ্রীগীতায় তিন ধরণের কর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল— কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম। কর্ম বলতে গীতায় কি বোঝানো হয়েছে তার আভাস পূর্বের আলোচনা থেকেই পাওয়া যায়। এই কর্ম হল সদা আচরণীয়। তাই অকর্ম অর্থাৎ কোনও প্রকার কর্ম না করা সদা পরিত্যাজ্য। আনেকেই মনে করেন যে কর্মের ভুল-ভ্রান্তির বেড়াজালে না পড়ে জ্ঞান মার্গ বা ভক্তি মার্গ-এর মাধ্যমে পরমাত্মতত্ব লাভই শ্রেয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, কেন নয় সেটাও গীতায় উল্লেখিত হয়েছে, বলা হয়েছে কর্মের ক্ষণমাত্র বিরতিও সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে কর্মহীনতা বা অকর্ম কোনও ভাবেই সমর্থন যগ্য নয়। এছাড়াও রয়েছে বিকর্ম অর্থাৎ বিরুদ্ধ কর্ম যা অকর্মের ন্যায় সদা বর্জনীয়। বিরুদ্ধ কর্ম বলতে বোঝানো হয়েছে যেকোনো প্রকার নিশেধাত্মক কর্মকে। শুধু তাই নয় বিধিবদ্ধ কর্মও যদি সম্পাদনের দিক থেকে বিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ কোনও শাস্ত্র বিহিত কাজও যদি কামনা বাসনা যুক্ত ভাবে সম্পাদিত হয় তাহলে ঐ কর্মও পরিত্যাজ্য কারণ তা বিকর্ম। এই তিন প্রকার কর্মের সম্যক ধারনা শ্রীগীতায় লাভ করা যায়।

এখন প্রশ্ন হল এই কর্ম কখন যোগে পরিণত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গীতাকার একটি সার্বিক পূর্ণাত্মক বিধিমূর্তির উল্লেখ করেছেন, সেটি হল নিষ্কাম কর্মের আদর্শ। এই নিষ্কাম কর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে গীতাকার বললেন, কর্মে জীবের অধিকার আছে ফলে নেই। ফলের বাসনা যেন কখনও না হয় এবং কর্মেও যেন অশ্রদ্ধা না আসে অর্থাৎ নিরন্তর কর্ম করার জন্য মগ্ন হয়ে কর্ম কর, অর্থাৎ তিনি এখানে কর্তব্য কর্ম পালনের কথা বললেন। আসক্তি ও সঙ্গদোষ ত্যাগ করে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার যোগে স্থিত হয়ে কর্ম করা উচিত। কোন কর্ম— নিষ্কাম কর্ম। এই সমত্ব ভাবকেই 'যোগ' বলা হয়— 'সমত্বং যোগ উচ্যতে'। নিষ্কাম কর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে— (১) সর্ব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, (২) কর্তৃত্বাভিমান-শূন্যতা, (৩) ফলাভিসন্ধি-শূন্যতা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে এই যোগী(নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন কারি) কে? শ্রীগীতায় এই যোগী কে বোঝাতে বিশেষ পরিভাষার ব্যাবহার করা হয়েছে, সমত্ব জ্ঞানসম্পন্ন এই মননশীল ব্যাক্তিকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলে আভিহিত করা হয়েছে।

'স্থিতপ্রজ্ঞ' শ্রীগীতার নক্ষত্র খচিত আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় জ্যোতির্ময়। স্থিতপ্রজ্ঞ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত যে পরিমাণে আলোচনা হয়েছে গীতার অপর কোনও বিষয়ে এতটা আলোচনা হয়েছে কিনা সন্দেহের আবকাশ থাকে। তার কারণ 'স্থিতপ্রজ্ঞ' গীতার আদর্শ, এই শব্দটি গীতার একান্তই নিজস্ব। গীতার আগের কোনও গ্রন্থে এঁর উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু গীতা পরবর্তীতে শব্দটির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বিষয়টি বুঝতে হলে তাঁর আগের কিছু বিষয় আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রায় শেষ পর্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁর আগে যে দুটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সেগুলি হল— (১) সাংখ্য-বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যার শাস্ত্র আর (২) যোগ-বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অনুযায়ী জীবন কলা। শাস্ত্র ও কলার সংমিশ্রণ ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটায়। এর বিপরীত পরিস্থিত হলে সেক্ষেত্রে প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। অধ্যাত্ম-বিদ্যা তথা মনুষ্য জীবন সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। মানুষের জ্ঞান তার বুদ্ধিতে গুপ্ত থাকবে, প্রকাশ পাবে তার আচরণ। আচরণ ও জ্ঞানে ব্যাবধান হলেও হতে পারে, কিন্তু এর বিরোধ যেন কোনও অবস্থাতেই না থাকে। আর আচরণ ও জ্ঞানের ব্যাবধানও ক্রমশ দূর করতে হবে— এই কাজটি যোগ-বুদ্ধির দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে।[৭]

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'স্থিতপ্রজ্ঞে'র লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।"(২/৫৫)

অর্থাৎ যখন জীব সমস্ত মনোগত বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন এবং আপনাতেই আপনি তুষ্ট থাকেন তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলে কথিত হন। এই শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষন দেওয়া হয়েছে তা সমুচিত ও পরিপূর্ণ। এখানে দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে— নিষেধক ও বিধায়ক। '"প্রজহাতি যদা কামান্' - এটি নিষেধক লক্ষন আর 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ' — এটি হল তাঁর বিধায়ক স্বরূপ। এই উভয়বিধ লক্ষণ নিশ্চিত ও সূক্ষ্ম ভাষায় বলা হয়েছে। "মনের সর্ব কামনা ত্যাগ" রূপ নিষেধাত্মক লক্ষণের কথা উক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে। জীবের মন বহুবিধ কামনার ভাঁড়ার ঘর। মনের এই কামনা মাত্রের সমূলে নাশ করতে হবে। ক্রমশ মনের সমস্ত কামনার পরিপূর্ণ ত্যাগ করা হচ্ছে স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যাখ্যার নিষেধাত্মক অঙ্গ।

"আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকা"— এটি সেই বিধায়ক লক্ষণ। স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মাতেই সন্তুষ্ট। বাইরের বিষয় অপেক্ষা ভিতরের দৃশ্যে সে তৃপ্ত। বস্তুত বাহ্যদৃশ্য অপেক্ষা অন্তরের দর্শনই অধিক সুন্দর, অধিক মহান। এখানে দ্বিবিধ লক্ষণের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে সন্তোষ কামনার পূর্ণ ত্যাগে, সন্তোষ আত্মাতেই অর্থাৎ নিজস্বরূপে। প্রথমটি স্বরূপত প্রারম্ভিক এবং দ্বিতীয়টি প্রগত। এই দুই লক্ষণ মিলে স্থিতপ্রজ্ঞের দর্শন পূর্ণ হয়।

শ্রীমদভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'স্থিতপ্রজ্ঞে'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আরও বলা হয়েছে—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেসু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচ্যতে।।" (২/৫৬)

অর্থাৎ দুঃখে যিনি উদ্বেগহীন, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যিনি সর্বতোভাবে আসক্তি, ভয়, এবং ক্রোধরোহিত হয়েছেন, সেই মননশীল ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। স্থিতপ্রজ্ঞের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় সকল কামনার আমূল ত্যাগের প্রত্যাশা বিদ্যমান। যদিও তা ততটাও সহজ নয়, তাই এই শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের আরও সহজ লক্ষণের কথা এখানে বলা হয়েছে। দুঃখ আসে তো উদ্বেগ বোধ করো না। উদ্বেগ বোধ করা মানে উতল হওয়া অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম করার সময় নানা প্রকার বাধাতেও মন যেন উতলা না হয়। দুঃখের মত সুখও সাবধানে হজম করতে হবে। সুখের ফাঁদে যেন মন ধরা না দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছুমাত্রও উদ্বেগ, আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ থাকে, ততক্ষণ তাঁকে সাধক বলা হয়। এগুলি সর্বতোভাবে দূর হলে তিনি সিদ্ধ হন, এরূপ মননশীল কর্মযোগীর বুদ্ধি স্থির ও অটল হয়ে যায়। এই কর্মযোগীই স্থিতপ্রজ্ঞ।

কর্মযোগে প্রেয় থেকে শ্রেয়র পথে উন্নিত হওয়ার কথা সর্বদা বলা হয়েছে, এই পথ কর্ম ত্যাগের নয়— কর্মফল ত্যাগের। কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন কর্ম সম্ভব হয় না, অতীব মূর্খ ব্যাক্তিও উদ্দেশ্য ব্যতিত কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। সাধারণ জীব ফল লাভের আশাতেই যেকোনও কর্ম করে তাহলে প্রশ্ন হল, ফলাসক্তি ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন কি সম্ভব? এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে নিষ্কাম কর্মও উদ্দেশ্যহীন নয়, 'লোক-সংগ্রহ', ভগবানের সৃষ্টি রক্ষায় এঁর উদ্দেশ্য। প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম সম্পাদিত হলে কর্তার কর্তৃত্ব থাকেনা, এমতাবস্থায় ফলাফলের সমত্ব-বুদ্ধি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই কর্মযোগ একদিকে যেমন পরমাত্মতত্ব লাভের পথ ঠিক পাশাপাশি পরমাত্মতত্ব লাভের পাথেয় ও বটে।

বহু প্রাচীনকাল থেকে অনেক মুনিঋষি নির্জনে মৌনাবলম্বন করে তপস্যা করেন শুধুমাত্র নিজ মুক্তি লাভের জন্য। তবে এঁর ব্যাতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। বহু বৈদিক মুনিঋষি এবং পরবর্তীতে গৌতম বুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁদের শিব জ্ঞানে জীব সেবা, আর্ত, পীড়িত, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থ শত সহস্র জীবের কল্যাণ সাধন— এ সবই লোক-সংগ্রহরই অন্তর্গত। তাঁদের কর্ম প্রেরণা সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে, মানুষের মূল্যবোধকে জাগরিত করেছে, সমাজের বহু মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়েছে, যা বর্তমান সমাজেও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১। শ্রীমদভগবদগীতা যথার্থ গীতা, স্বামী শ্রীঅড়গড়ানন্দজী, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৫
২। কথায় কর্মে এথিকস, সোমনাথ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৮৪
৩। শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ, শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী, পৃষ্ঠা ৫৩৮
৪। ভারতীয় দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, পৃষ্ঠা ২৪১
৫। শ্রীগীতা, জগদীশচন্দ্র ঘোষ, পৃষ্ঠা ৬০
৬। শ্রীমদভগবদগীতা যথার্থ গীতা, স্বামী শ্রীঅড়গড়ানন্দজী, পৃষ্ঠা ৫৪
৭। শ্রীমদভগবদগীতা, স্বামী রামসুখদাস, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯

গ্রন্থপঞ্জী:

(১) কর, শ্রীগঙ্গাধর, মহাজীবনের অন্তরালে, কলকাতা, সেন্টার অব্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯।
(২) গোস্বামী, নৃপেন্দ্র, বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি (প্রথম ভাগ), কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৫।
(৩) ঘোষ, জগদীশচন্দ্র, শ্রীগীতা, বড়নীলপুর, নারায়ণ প্রকাশনী, ২০০০।
(৪) চক্রবর্তী, সোমনাথ, কথায় কর্মে এথিকস, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৯।
(৫) মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১০।

(৬) শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী, শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ, শ্রীমায়াপুর, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ২০১১।
(৭) শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭।
(৮) শর্ম্মা, শ্রীপূর্ণচন্দ্র, পাতঞ্জল দর্শন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৫।
(৯) স্বামী বিবেকানন্দ, কর্মযোগ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, সপ্তবিংশ সংস্কর, ২০১৭।
(১০) স্বামী রামসুখদাস, শ্রীমদভগবদগীতা, সাধক-সঞ্জীবনী, গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস, ২০১৮।
(১১) স্বামী শ্রীঅড়গড়ানন্দজী, শ্রীমদভগবদগীতা যথার্থ গীতা, মুম্বাই, শ্রীপরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী ট্রাস্ট, ২০১২।
(১২) স্বামী সুন্দরানন্দ, যোগচতুষ্টয়, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৫।